কিশোর আলো

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

আমি কখনো ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হইনি — এহসান হক

আলিমুজ্জামান

প্রকাশ: ১৯ জুলাই ২০২২, ১৭: ০০

ক্লাসের প্রিয় বন্ধুটির পাশে বসে ক্লাস না করতে পারলে তোমার দিনটাই যেন পানসে হয়ে যায়। তবে মাঝেমধ্যে তোমার এই মানুষ বন্ধুটিও একটু-আধটু দুষ্টুমি করে তোমায় জ্বালাতন করতেই পারে। কিন্তু তোমার বন্ধু যদি হয় একটা রোবট? যে তোমার মনের অবস্থা বুঝে কথা বলবে তোমার সঙ্গে? এমনই সব মজাদার প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন আমাদের দেশের গবেষক এহসান হক। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে তিনি পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ২০০৫ সালে পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক এবং ২০০৭ সাল নাগাদ মেমফিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর শেষ করেন। এরপর ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মিডিয়াল্যাবে নিজের পিএইচডি শুরু করেন। সেখানেই তিনি মানুষের মুখের পরিবর্তন দেখে কথা বুঝতে পারে এমন দুটি সফটওয়্যার ম্যাক ও লিসা উদ্ভাবন করেন। ২০১৬ সাল নাগাদ প্রকাশিত ‘এমআইটি টেকনোলজি রিভিউ’-এ সেরা ৩৫ বছরের কম বয়সী গবেষকদের তালিকায় নাম উঠে আসে তাঁর। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টারের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন এই তরুণ উদ্ভাবক। ২০১৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি হাজির হন কিশোর আলো কার্যালয়ে। মুখোমুখি হন কিশোর আলোর। শোনান তাঁর জীবনের নানা গল্প। কিশোর আলোর পক্ষ থেকে আলাপচারিতায় অংশ নেয় **আলিমুজ্জামান**। ছবি তুলেছেন **খালেদ সরকার**।



ছবি: খালেদ সরকার

প্রশ্ন : আপনি কবে থেকে প্রোগ্রামিং করছেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করার পর।

প্রশ্ন : হঠাৎ করে কেন মনে হলো যে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে?

আসলে আমাদের সময়ে কেবল কম্পিউটার সহজলভ্য হওয়া শুরু করেছিল। তখন চারদিকে সবাই কম্পিউটার সায়েন্স ও প্রোগ্রামিং নিয়ে পড়তে আগ্রহী। কেননা, তখন মানুষের মধ্যে এই ভাবনা ছিল যে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করলে ভালো চাকরি পাওয়া যাবে সহজে। তাই আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। তবে এ ছাড়া দেশে থাকতে আমি কম্পিউটারে আর সবার মতোই গান শোনা, মুভি দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে গিয়েই আমার প্রথম কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং করার হাতেখড়ি হয়।

প্রশ্ন : অনেকেই মনে করেন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করার জন্য মেধাবী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে কী বলবেন?

প্রোগ্রামিংসহ যেকোনো কাজেই আসলে গণিতে দক্ষতা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি যেকোনো বিষয় যুক্তিযুক্তভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তবে আমার ক্ষেত্রে মনে হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স বা প্রোগ্রামিং করার ক্ষেত্রে ধৈর্য থাকা খুবই জরুরি। প্রথমদিকে আমি যখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করতাম, তখন দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই সমস্যা নিয়ে কাজ করতে হতো। নানাভাবে চেষ্টা করেও বেশির ভাগ সময় সমস্যাটার সমাধান করতে পারতাম না। বারবার একই

সমস্যার প্রোগ্রামে আমাকে নিজের ভুল খুঁজে বের করতে হতো। তখন যদি আমি আমার ধৈর্য না ধরে রাখতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আজ প্রোগ্রামার হতে পারতাম না।

প্রশ্ন : সে ক্ষেত্রে যারা সবে প্রোগ্রামিং শুরু করছে, তাদের ধৈর্য ধরে প্রোগ্রামিং করার জন্য কী পরামর্শ দেবেন?

চমৎকার প্রশ্ন করেছ। আমি যখন প্রোগ্রামিং শিখেছি, তখন আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছে সিনট্যাক্স শেখার জন্য। তবে প্রোগ্রামিং বিষয়টিকে এখন বেশ আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপন করা হয়। স্ক্র্যাচে ব্লক দিয়ে কোনো রকম কোডিং ছাড়াই প্রোগ্রামিং করা যায়। তাই এখন আসলে প্রোগ্রামিংয়ে বিরক্ত লাগা বা ধৈর্য হারানোর সুযোগ কম। সে ক্ষেত্রে নতুন শুরু করার সময় কয়েকজন মিলে গ্রুপ করে শুরু করতে পারে। তাহলে বিষয়টি ভালো লাগবে আশা করি। আর প্রোগ্রামিং শেখার মূল বিষয় কিন্তু কোড করতে শেখা নয়। বরং কোনো লজিক নিয়ে চিন্তা করতে পারাই প্রোগ্রামিং করার মূল লক্ষ্য। তাই সিনট্যাক্সের ওপরে জোর না দিয়ে বরং সেই প্রোগ্রামিংয়ের লজিক দিয়ে কী ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারছে, সেটা চিন্তা করাই বড় বিষয়।

প্রশ্ন : কলেজজীবনে ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান ক্লাব নিয়ে কাজ করেছেন। ক্লাব নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই।

আমি যখন ১৯৯৬ সালে ঢাকা কলেজে ঢুকি, তখন কলেজে কোনো বিজ্ঞান ক্লাব ছিল না। দেখা যেত ছেলেরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ক্যানটিনে খিচুড়ি খেতে যায়, মাঠে ফুটবল খেলে কিংবা পুকুরপাড়ে আড্ডা দেয়। আমার মনে হলো ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি সৃজনশীল কোনো কিছু করা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে আমি বিজ্ঞান ক্লাব নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার কাছে মনে হয় আমার কলেজজীবনে বিজ্ঞান ক্লাব নিয়ে যে অভিজ্ঞতা ছিল, সেটা আমার পড়াশোনার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাবের কাজ করতে গিয়ে আমাকে নানা রকম মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। ক্লাবের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমি নেতৃত্ববোধের বিষয়ে সচেতন হয়েছি।

প্রশ্ন : ক্লাবের কাজ করতে গিয়ে কি কখনো পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে?

আমার মনে হয় না কখনো ক্লাবের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে। বরং আমি তখন না বুঝে অনেক কিছু মুখস্থ করতাম। তাই পড়াশোনার প্রতি আমার আগ্রহ কম ছিল। মুখস্থ করে এসএসসি পাস করলেও আসলে এইচএসসিতে যখন বিষয়ের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই ক্লাবের জন্য পড়াশোনার ক্ষতি আমার কখনোই হয়নি। আমার কারিকুলাম আমার জন্য সমস্যার কারণ হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি একসময় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মিডিয়া ল্যাবের সঙ্গে কাজ করেছেন। আমাদের দেশে এ ধরনের কী করা যেতে পারে?

আসলে আমাদের দেশের জন্য মিডিয়া ল্যাবের গবেষণার সরাসরি কোনো প্রয়োগ না-ও থাকতে পারে। মিডিয়া ল্যাব মূলত চোখ ধাঁধানো নানা রকম কাজের মাধ্যমে স্পনসরদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ওদের সময়ের জন্য সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের জন্য তো বিষয়টি এখনো এ রকম নয়। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে এখন নির্বাচন করে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করা প্রয়োজন। মিডিয়া ল্যাব বা এ ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্ধভাবে অনুসরণ করার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তাদের গবেষণার যে

লক্ষ্য, যে স্পৃহা নিয়ে তারা কাজ করে, সে বিষয়টি অবশ্যই অনুকরণীয়। যেমন মিডিয়া ল্যাবের কাজের লক্ষ্য হলো মানুষের জন্য কাজ করা। আমরা মাঝেমধ্যে কোনো গবেষণা করতে করতে ভুলেই যাই যে এটার প্রয়োজন কী। কেন আমার গবেষণা করা প্রয়োজন, সে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নির্ধারিত কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণা করা হলে সেটিতে অচিরেই সফলতা লাভ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : ২০১৬ সালে আপনি এমআইটি কর্তৃক নির্বাচিত সেরা ৩৫ বছরের কম বয়সী বিজ্ঞানীদের তালিকায় নির্বাচিত হন। সেই ঘটনার অনুভূতি জানতে চাই।

অধিকাংশ গবেষণায় আমার অনুপ্রেরণা ছিল ব্যক্তিগত নানা বিষয়। আমি বর্তমানে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের মানসিক চিকিৎসার বিষয়ে কাজ করছি। কারণ আমার মা মারা গেছেন ক্যানসারে। যারা বিশেষভাবে সক্ষম, আমি এমন মানুষের জন্য গবেষণা করি। কারণ, আমার ছোট ভাইয়ের ডাউনসিনড্রোম আছে। আমি সব সময়ই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করি। কারও কথা শুনে কাজ করা বা কোনো দামি বিষয়ে কাজ করার প্রতি আমার আগ্রহ কম। বরং আমার নিজের যে বিষয়টি ভালো লাগে, সেটা নিয়ে কাজ করতেই আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তাই কেউ আমার সঙ্গে থাকছে কি না, কেউ আমাকে সাহায্য করছে কি না, সে বিষয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। বরং নিজের কাজের জন্য যখন কোনো সম্মাননা পাই, তখন বুঝতে পারি যে ঠিক রাস্তাতেই চলছি। তাই এ ধরনের সম্মাননা আসলে আমার কাজে উদ্যম বাড়াতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করে।

প্রশ্ন : আপনার একটি মজার গবেষণা আছে মুড মিটার নিয়ে। আমাদের জন্য বিষয়টি একটু সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন কি?

অবশ্যই বলব। মুড মিটার নিয়ে কাজ শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উৎসবের সময়। তখন আমরা চিন্তা করি যে উৎসবে যারা আসবে, তাদের উৎসবে আসার অনুভূতি কেমন, এটা বোঝার জন্য কিছু বানানো যায় কি না। আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চারটি জায়গায় ক্যামেরা বসাই। ক্যামেরাগুলো মূলত মানুষের চোখ, মুখ, চেহারা, অঙ্গভঙ্গির নানা রকম বিশ্লেষণ করে বলে দিচ্ছে যে মানুষটি হাসছে নাকি হাসছে না। এসব তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি ওয়েবসাইটে গিয়ে জমা হচ্ছে। ফলে সহজেই ওই উৎসবের সার্বিক আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : ভবিষ্যতে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়, তাদের জন্য কী পরামর্শ দেবেন?

আমি সব সময় কাজ শুরু করি অনুপ্রেরণা দিয়ে। কোনো বিষয়ের দক্ষতা বা চৌকসতা নিয়ে আমি কাজের পরিকল্পনা করি না। আমার মনে হয় এখন আর এটা ভাবার প্রয়োজন নেই যে সবাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করছে, তাই তাকেও এটা নিয়েই করতে হবে। বরং নিজের চারপাশের কোনো একটি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তুমি যে সমস্যার সমাধান করতে চাও, সেই সমস্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেই বুঝতে পারবে যে ওই সমস্যার জন্য কোন ধরনের সমাধান প্রযোজ্য। তখন যদি ওই সমস্যা সমাধানের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা রোবোটিকসের প্রয়োজন হয়, তখন সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমার কাছে সব সময় মনে হয় কাজের ধারা আসলে কোনো প্রযুক্তি দিয়ে শুরু করা উচিত নয়। বরং কোনো সমস্যা সমাধানের অনুপ্রেরণাই মানুষকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানপ্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেকেই দেশে পড়াশোনা করতে চায় না। অধিকাংশ মানুষ এ রকম বিষয়ে পড়াশোনার জন্য দেশের বাইরে চলে যায়। দেশে থেকে এসব বিষয়ে কীভাবে ভালো করা সম্ভব?

আমার মনে হয় গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। কারণ, আমাদের দেশে এখন কাজ করার নানা রকম সুযোগ রয়েছে। দেশে এখনো নানা রকম সমস্যা রয়েছে, যেগুলো সমাধান করার জন্য অনেক রকম গবেষণার প্রয়োজন। আমাদের দেশের এই বিপুল জনগণকে যদি আমরা দক্ষভাবে গড়ে তুলি, সেটার যে প্রভাব পড়বে, তা অন্য কোনো দেশে সম্ভব নয়। সে জন্য আমাদের দেশে এখন কাজ করার নানা রকম সুযোগ রয়েছে। তাই আমি সব সময় বলি সমস্যা নিয়ে কাজ করতে। যেমন মনে করো, আমাদের দেশের ট্রাফিকের কথাই যদি বলি, তাহলে এটা কিন্তু এখন একটা বড় ধরনের সমস্যা। জনসংখ্যা, পরিবেশদূষণের মতো বড় বড় সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের কাজ কম। এখন যদি কেউ দেশে থেকে এসব সমস্যা চিহ্নিত করে কাজ করে, অবশ্যই বাংলাদেশে তার বেশ ভালো কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সবার সামনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ফলে দেশে কী পরিবর্তন আসবে, সেই ফলাফল তুলে ধরা উচিত।

প্রশ্ন : একজন প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য একাডেমিক পড়াশোনার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

আমার কাছে মনে হয় সব কাজেই আসলে সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পড়াশোনার পাশাপাশি যেমন মন দিয়ে প্রোগ্রামিং করতে হবে, তেমনি পরীক্ষায়ও ভালো ফলাফল ধরে রাখতে হবে। তবে নিজের ভালো লাগার কাজটিকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। পড়াশোনার চাপে কিংবা পারিবারিক চাপে নিজের ভালো লাগার কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

প্রশ্ন : আপনার তৈরি সফটওয়্যার লিসা ও ম্যাক কীভাবে কাজ করে? এটি বাংলাদেশের জন্য কীভাবে উপযোগী?

এই দুটি সফটওয়্যারই আসলে তৈরি করা হয়েছে বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। বিদেশে আসলে থেরাপিস্টের প্রয়োজন অনেক বেশি। কিন্তু এটি বেশ ব্যয়বহুল। কিন্তু বাংলাদেশে আমার মনে হয় না এ ধরনের সমস্যা আছে। বরং আমার মনে হয় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে পারি। আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানুষ আছে। ফলে লিসা ও ম্যাককে ব্যবহার করে আমরা যদি সাধারণ মানুষকে নানা রকম প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে বিষয়টি আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে আমার ধারণা।

প্রশ্ন : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ভবিষ্যতে কি রোবটও সাহিত্যচর্চায় অংশগ্রহণ করবে?

আমার কাছে মনে হয় রোবটকে দিয়ে আমরা যা করাতে চাই, রোবট আসলে তা-ই করবে। হয়তো আগামী ১০০-২০০ বছর পরে রোবটগুলো এ রকম সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন সঠিক প্রশ্ন হলো আমরা এ রকমটা চাই কি না। আমি মনে করি, আমাদের মানুষের যে দক্ষতা, মানুষের যে সৃজনশীলতা, সে বিষয়টি আসলে নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে রোবট যদি একজন মানুষকে লিখতে সাহায্য করে, মানুষকে তার সৃজনশীল কাজে আরও দক্ষ হতে সাহায্য করে, সে বিষয়টি খুবই চমৎকার হবে। ফলে রোবট যেন কখনো আমাদের বিপরীত পক্ষ হয়ে কাজ না করে। বরং আমাদের একজন সাহায্যকারী হিসেবে রোবটের ব্যবহার নিশ্চিত করাই শ্রেয়।

ছবি: খালেদ সরকার

প্রশ্ন : আপনি সব সময় মানুষকে সাহায্য করতে সফটওয়্যার বানান। কিন্তু যদি কখনো রোবট আপনাকে ওর জন্য এমন কিছু বানাতে বলে?

ও রকম রোবট আমি বানাবই না, যে আমার কাছে এমন মামার বাড়ির আবদার করবে।

প্রশ্ন : স্কুল-কলেজজীবনে এমন কোনো ভুলের কথা মনে হয়েছে, যেটা না শোধরানোর জন্য পরে আফসোস করেছেন?

(বেশ কিছু সময় চিন্তা করে) আমার কাছে মনে হয় স্কুল-কলেজে থাকতে আমি পরীক্ষার নম্বরের পেছনে বেশি দৌড়েছি। আমার তখন নিজের অনুপ্রেরণার জায়গাগুলোতে আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে কাজ করা উচিত ছিল। জানার জন্য আসলে পড়াশোনা করা উচিত ছিল। তখন শুধু পরীক্ষায় ভালো করার জন্য গৎবাঁধা সিলেবাসের দাগানো বিষয়গুলো পড়েছি। কিন্তু সেটা না করে প্রকৃতভাবে কোনো কিছু জানার জন্য পড়লে আমার অভিজ্ঞতা আরও ভালো হতো, যা পরবর্তী সময়ে আমাকে আমার পেশাজীবনে বেশি সাহায্য করত।

প্রশ্ন : আপনার জীবনের সেরা প্রাপ্তি কোনটি?

আমার মনে হয়, আমি এই যে এখন মাঝেমধ্যেই দেশের মানুষের কাছে ফিরে আসতে পারছি, এটাই আমার জন্য বড় পাওয়া। আমি আমার সামান্য দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশের সাধারণ তরুণদের অনুপ্রেরণা দিতে পারছি, এটা আমাকে বেশি স্বস্তি দেয়। এ ছাড়া আমি যেসব গবেষণা করেছি, সেগুলোর বেশির ভাগই ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা থেকে করা। দিন শেষে আমি সেগুলোতে সফল হয়েছি। ফলে নিজের ভালো লাগার বিষয়গুলোতে সফল হওয়াই আসলে আমাকে তৃপ্তি দেয় সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন : কিশোর আলোর পাঠকদের উদ্দেশে কী বলবেন?

জীবনে আসলে ভালো কিছু করার অনেক রকম পথ রয়েছে। স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভালো ফলাফল না করেও কিন্তু জীবনে অনেক ভালো কিছু করা যায়। আমার কাছে জীবনে ভালো কিছু করার আরেকটি উপায় হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা। আমি কখনো ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হইনি। তাই বলে কিন্তু আমি থেমে থাকিনি। বরং আমার লক্ষ্য ছিল আমাকে যেভাবেই হোক সামনে যেতেই হবে। কেউ আমাকে আমার লক্ষ্যপূরণ থেকে থামাতে পারবে না। কোনো কারণে ব্যর্থ হলে আমি আবার নতুন উপায়ে চেষ্টা করব আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে। পাশাপাশি জীবনে একটা পরিকল্পনা থাকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমার ব্যক্তিগত একটি গুগল ডক আছে, যেখানে আমি আমার আগামী কয়েক বছরের কোন মাস নাগাদ কী করব সেটা লেখা আছে। আমি কী কী ধরনের সুযোগ নিয়ে কাজ করব, সে বিষয়গুলোও আমি লিখে রেখেছি। সে ক্ষেত্রে সবকিছুই খুব বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখা। মানে যেটা হয়তো বাস্তবে সম্ভব, কিন্তু অনেক কঠিন। সে ক্ষেত্রে আমি যেটাতে ব্যর্থ হই, সেই কাজের লেখাটা আমি লাল কালি দিয়ে লিখি। ফলে গোটা ডকের বেশির ভাগ অংশই লাল কালিতে ভরা। কিন্তু যখন দু-একটি কাজে আমি সফল হই, মানে ডকে কিছু লেখা সবুজ কালিতে ভেসে ওঠে, তখন আসলে নিজেই অন্য রকম একটা শান্তি পাই। আমাদের চিন্তা করতে হবে অনেক উঁচুতে। তাহলে যে সামান্য সফলতাও আসবে, সেটাই হবে তোমার জীবনের সেরা পাওয়া। তাই জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখো আর নিজের পরিকল্পনা করে সে অনুসারে কাজ করো। আগামী দিনগুলোতে সফল তুমি হবেই।

(কিশোর আলোর ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত)

কিআ